Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual- Peer Reviewed-Bi-Annual
Digital Research Journal
Website : santiniketansahityapath.org.in
ISSN 2583-6706 (Online)
Volume-3 Issue-1 July 2024

ব্যাধখণ্ড: জনজাতি-জীবন ও পরিবেশের যৌথ আখ্যান

মৌমিতা হালদার

Link : https://santiniketansahityapath.org.in/wp-content/uploads/2024/07/7_Moumita-Haldar.pdf

সারসংক্ষেপ: জনজাতি, প্রকৃতি ও পরিবেশের এক অভূতপূর্ব সহাবস্থান পরিলক্ষিত হয় মহাশ্বেতা দেবীর ব্যাধখণ্ড উপন্যাসে। প্রকৃতি এবং পরিবেশের মতোই জনজাতিগুলির অস্তিত্বের যে সংকট মাথাচাড়া দিয়েছে স্বাধীনোত্তর ভারতে, তারই এক অপূর্ব আখ্যান এই 'ব্যাধখণ্ড' উপন্যাস। আধুনিকতা, বিশ্বায়নের সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে নিজেদের আদিম প্রবৃত্তি, অরণ্য জীবনযাপন ও কৌম সমাজের যে গঠন তা কীভাবে ক্রমশ ছন্দপতিত হচ্ছে তা উঠে এসেছে এই উপন্যাসে। বিশ শতকে আধুনিকতা ও নগরায়ন যে একাকীত্বের জন্ম দিয়েছে তার প্রকোপ পড়েছে আদিবাসী জনজীবনে। কৌম সমাজ ভেঙে একক হয়ে উঠেছে। আর এর জন্য দায়ী পুঁজিবাদ, ভোগবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ। অস্তিত্ব এবং অস্তিত্বের সংকট এই দুটি ধারায় কীভাবে একে অপরের পাশাপাশি যৌথভাবে অবস্থান করছে এবং মানবসমাজের গভীরতর সংকটকে সূচিত করছে তার অপূর্ব আখ্যান ফুটে উঠেছে মহাশ্বেতা দেবীর ব্যাধখণ্ড উপন্যাসে।

সূচক শব্দ: অরণ্য, প্রকৃতি, পরিবেশ, জনজাতি, ঐতিহ্য, শিকার, বাস্তুতন্ত্র, নগরায়ন

অরণ্যবাসী মানুষ, যারা সম্পূর্ণরূপে অরণ্যের উপর নির্ভরশীল, তাদের প্রয়োজন মেটাতে সমগ্র অরণ্য রসাতলে যেতে পারতো, তা কিন্তু হয়নি। আদিম জনগোষ্ঠীর মানুষেরা দেবতাজ্ঞানে অরণ্য, নদ-নদী, পাহাড়কে রক্ষার চেষ্টা চালিয়ে গেছে। কোনো কোনো অরণ্য, ভুখণ্ডকে তারা 'পবিত্র থান' বলে নির্দিষ্ট করে সেগুলিকে সংরক্ষণ করত। মাধব গাডগিলের মতে — "একটি পবিত্র অরণ্যখণ্ডকে ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে সংরক্ষণ করা হলেও এই বনখণ্ডগুলির উপকারিতাকেই (যেমন বনের আবরণের সংরক্ষণের মাধ্যমে মিষ্টি জলের উৎসগুলি সুরক্ষিত করা) আমার তাদের সংরক্ষণের সম্ভাব্য আসল কারণ বলে মনে হয়েছিল।"[১] যদিও সভ্য শিক্ষিত নাগরিক মানুষেরা প্রাকৃতিক সম্পদ অবক্ষয়ের জন্য দায়ী করেছে গ্রাম্য মানুষের অজ্ঞতাকে। মুণ্ডা, শবর, ওঁরাও প্রভৃতি জনজাতির জীবনচর্যার মূলে আছে প্রকৃতি ও মানুষের সহাবস্থান। মহাশ্বেতা দেবীর রচনায় বারবার উঠে এসেছে এই সমস্ত জনজাতির কথা। লিখিত ইতিহাসে যে মানুষগুলোর কোনো স্থান নেই, নিজস্ব ঐতিহ্য টিকে আছে শুধু কথ্যপরম্পরায়, নগরকেন্দ্রিক সভ্যতায় তাদের অস্তিত্বসংকট খুবই স্বাভাবিক। ১৮৭১ সালে প্রথম শবরদের মতো কিছু উপজাতিকে 'অপরাধপ্রবণ' ঘোষণা করে ব্রিটিশ শাসকরা। ১৯৪৯ সালে আইন বাতিল করা হলেও ১৯৫২তে আনা হয় 'অভ্যাসগত অপরাধী আইন, ১৯৫২' সমাজের মূলস্রোত থেকে ক্রমাগত বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয় সন্দেহ তালিকাভুক্ত বিভিন্ন জনজাতির মানুষকে। জাতির ইতিহাসই একমাত্র প্রান্তীয় মানুষগুলির হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করতে পারতো। মহাশ্বেতা দেবী তাই সংগ্রহ করার চেষ্টা করেছেন লোকমুখে প্রচলিত এই সমস্ত জাতির অতীত কাহিনিকে, কারণ সমাজে তারা যেন পুনরায় মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে। 'বর্তিকা' পত্রিকায় ১৯৮২ সালে প্রকাশিত হয়েছিল 'লোধাশবর' সংখ্যা। এখানে লোধারা নিজেদের সম্পর্কে লিখেছিল। এই লেখাগুলি থেকে প্রাপ্ত উপাদানের উপর ভিত্তি করে শবরদের জীবনচর্যা, বিশ্বাস জনসমাজে তুলে ধরার প্রয়াস থেকে মহাশ্বেতা দেবী ১৯৯৪এ প্রকাশ করেন 'ব্যাধখণ্ড' উপন্যাসটি।

'ব্যাধখণ্ড' উপন্যাসে বর্ণিত ব্যাধ জীবনের মূল কাহিনি মহাশ্বেতা দেবী গ্রহণ করেছেন মুকুন্দ চক্রবর্তীর 'অভয়ামঙ্গাল' কাব্যের 'আখেটিক খণ্ড' থেকে। ভূমিকা অংশে মহাশ্বেতা দেবী জানিয়েছেন — "মুকুন্দরামের কাব্য এর আকর, কিন্তু শবর জীবন লেখার সময় আমি (১) তাঁর গ্রন্থ + (২) আমার সামান্য জানাজানি + (৩) আমার অনুসন্ধেয়, তিনটি মিলিয়েছি।"[২]

'ব্যাধখণ্ড' উপন্যাসে ব্যাধ জীবনের সঙ্গে মুকুন্দ চক্রবর্তীর পরিচয় কীভাবে ঘটলো তার বর্ণনার প্রেক্ষিতে উঠে আসে মুকুন্দ চক্রবর্তীর সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত। দামিন্যা ত্যাগ করে আরড়ায় এসে নতুন বাসস্থাপনই যেন শবরদের অন্ত্যজ জীবন সম্পর্কে মুকুন্দ চক্রবর্তীকে জানার পথকে সুগম করেছিল। বিস্মিত দর্শকের মতোই কবি অবাক হয়েছিলেন শবর জীবনচর্যা দেখে। শবর সমাজে নারী-পুরুষের সমানাধিকার, রাজাকে না মানার মতো দুঃসাহসী স্বাধীনচেতা মনোভাব, অস্থি-মজ্জায় গেঁথে থাকা নিজস্ব সংস্কৃতি পালন — মুকুন্দের সামনে যেন এক অপরিচিত জগতের দ্বারন্মোচন করে। অরণ্যচারী শবর জীবনের পাশাপাশি মহাশ্বেতা দেবী সমসাময়িক অস্থির রাজনৈতিক পটভূমিকেও তুলে ধরতে চেয়েছেন। অত্যাচারিত হওয়ার ভয়ে মুকুন্দকেও পিতৃপুরুষের ভিটে ত্যাগ করে সপরিবারে অজানা ভবিষ্যতের পথে পাড়ি দিতে হয়েছিল। সমাজের মূলস্রোতের মানুষ হয়েও তিনি একারণেই অরণ্য ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হওয়া ব্যাধদের যন্ত্রণা অনুভব করতে পেরেছিলেন। মহাশ্বেতা দেবী জানিয়েছেন —

"শবর বলতে যৎসামান্য জানি পশ্চিমবঙ্গে মেদিনীপুরের লোধাশবর ও পুরুলিয়ার খেড়িয়াশবরকে। দুটিই আদিবাসী গোষ্ঠী, মূলে অরণ্যজীবী ।"[৩]

ব্যাধ জাতির জীবিকাই হলো পশুশিকার। শিকার করা পশুর মাংস, চামড়া, হাড়, পালক, দাঁত ইত্যাদি বিক্রি করে তারা তাদের প্রয়োজনীয় রসদ জোগাড় করে। যেহেতু শবররা অরন্যবাসী তাই তারা চাষবাস করে না। অনেক প্রাচীন ধ্যানধারনার মতো এটাও তাদের সমাজের বিধান, শবররা কখনো চাষ করবে না। কারণ লাঙলের দ্বারা মাটি কর্ষণে ব্যাথিত হবে ধরিত্রীমাতা। এরা পশু শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করছে অথচ নিজেদের প্রয়োজন আর অতিরিক্ত চাহিদার মধ্যে একটা গণ্ডী টেনে রাখছে। বর্তমান পুঁজিবাদের মূল কথাই হলো প্রয়োজনের অধিক সম্পদে আধিপত্য বিস্তার। প্রথম বিশ্বের দেশগুলির সবচেয়ে সর্বনাশা ধারণা হলো মানুষই গোটা পৃথিবীর মালিক, পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ আসলে মানুষের সম্পদ, ইচ্ছেমত কাজে লাগিয়ে দেওয়াই প্রগতির পরিচয়। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিও ক্রমশ এই ভোগবাদী দর্শনের আওতায় ঢুকে পড়েছে। অথচ আমাদের প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য অনুযায়ী প্রকৃতি দেবস্থানীয় এবং মানুষের কাছে পূজ্য।

প্রাচীন যে সমস্ত জনজাতি শেষপর্যন্ত সকল ঔপনিবেশিক শাসনের হাত থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখতে অসম লড়াইয়ে অংশ নিয়েছিল তাদের অসীম সাহসের মূল ভিত্তি ছিল নিজস্ব ধর্ম-সংস্কৃতির উপর আস্থা এবং নিজস্ব কিছু সামাজিক রীতিনীতি। এই সমাজ বন্ধনের দুটি প্রান্ত ছিল — এক, তাদের নিজস্ব গোষ্ঠীর শৃঙ্খলপরায়ণতা; দুই, আশ্রয়দানকারী প্রকৃতির যথার্থ মূল্যদান। বাকি সমস্ত কিছুকে বর্জন করাই শ্রেয় বলে মনে করত তারা। 'ব্যাধখণ্ড' উপন্যাসের কাল্যাকে তাই গর্বভরে বলতে শোনা যায়,

"অভয়াচণ্ডী তোমাদের দিয়েছে পুজো, পুঁথি, হামার, গোহাল! আমাদের দিয়েছে জঞ্জাল। আমরা শবর হে, জঞ্জালের সন্তান !"[৪]

কাল্যা চরিত্রের মধ্যে একধরণের অস্থিরতা দেখা যায়। এক ধরণের ভীতি তাঁর আচরণকে কঠিন পাশবিক করে তোলে। এই ভীতি হলো নিজস্বতা হারিয়ে ফেলার ভীতি। নগর যতো প্রসারিত হতে থাকবে, নগরের সঙ্গে অরণ্যের নৈকট্য যতো বাড়বে শবরদের রীতি-কানুন তত বদলে যেতে থাকবে। নগরবাসীর গোলা ভরা ধান, সুসজ্জিত গৃহের সুশীতল শান্তি শবরদের যতো আকর্ষিত করবে তত তারা নিজেদের সমাজ ও গোষ্ঠীর প্রতি বিমুখ হয়ে উঠবে, হয়ে উঠতে চাইবে সাধারণ গৃহস্থের মতো। চাষ চষা শুরু করবে কারণ নগর সভ্যতা শেখায় জীবনে সুখী থাকতে হলে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় প্রয়োজন। সনা সঞ্চয় করতে শিখেছে, সে শবরদের নিয়ম-নীতি লঙ্ঘন করে ঘরের চালায় খড় দেয়, মাটির দেওয়াল তুলে চিত্র আঁকে। ফুলির মধ্যেও এই বাসনা দেখা যায়। কাল্যা যেন ফুলির এই অদৃশ্য বাসনাকে দেখতে পায়, অকারণ প্রহার করে মনের জ্বালা মেটায়। প্রাচীন শবরদের মনেও সঞ্চারিত হয় ভীতি — "কালের নিয়ম, কালের নিয়ম! আনজাত যত আগায়, শবর বোঝে তার নিজস্বতা থাকবে না। ব্যাস, ডেরা-ডাণ্ডা উঠিয়ে মা! মা! ডাকতে ডাকতে চলে যায় কোনও কুমারী বনভূমির আঁচলে।"[৫] এই মা, মা অভয়াচণ্ডী। যে — "বন বল, জানোয়ার বল, পাখি বল, শবর বল, সকলেরে অভয় দিয়ে আগুলে রাখে।"[৬]

একদিকে অরণ্যকে মা এবং বনের সমস্ত পশুকে তার সন্তান মনে করা, আর একদিকে জীবহত্যা — এই দুই বিপরীত ভাবনাকে বুঝতে গেলে আমাদের ইকোসিস্টেমের ধারণাকে বুঝতে হবে। এই ক্রিয়াপদ্ধতিতে কোনো অঞ্চলে বসবাসকারী উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানুষ নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি করার পাশাপাশি সেই অঞ্চলের মাটি, জল, বায়ু, সূর্যালোকের সঙ্গেও সম্পর্ক তৈরি

করে। বাস্তুতন্ত্রের সজীব উপাদানের মধ্যে রয়েছে উৎপাদকশ্রেণি, খাদক শ্রেণি ও বিয়োজক শ্রেণি। উৎপাদক শ্রেণি থেকে যে প্রক্রিয়ায় খাদক ও বিয়োজক স্তরে শক্তির স্থানান্তর ঘটে, তাকে খাদ্যশৃঙ্খল বলে। খাদক শ্রেণির মধ্যে মানুষ সর্বভুক পর্যায়ের। অর্থাৎ মানুষ একই সঙ্গে তৃণভোজী এবং মাংসাশী। আদিম যুগ থেকেই মানুষ পশু শিকার করে আসছে এবং পশুমাংস ভক্ষণ দ্বারা নিজের প্রয়োজনীয় দৈহিক পুষ্টির জোগান দিচ্ছে। আমাদের পরিপাকতন্ত্রের গঠনও এর প্রমাণ দেয় যদিও মানুষ সভ্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ পশুশিকার ত্যাগ করে পশুপালন ও কৃষিকাজ — এই দুইয়ের উপর নির্ভরশীল হয়ে ওঠে। এখন আমরা যারা আমিষাশী, তারাও সাধারণত পশু-পাখি পালন থেকে প্রাপ্ত মাংস সরাসরি অথবা অর্থের বিনিময়ে পেয়ে থাকি। আদিম জনজাতিগুলির মধ্যে বিশেষ উৎসব-অনুষ্ঠানে শিকারের প্রচলন থাকলেও বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের তাগিদে হনন করা হয়েছে তাদের স্বাধীন শিকারের অধিকার। এর কারণ হিসাবে দেখানো হয় বিভিন্ন জীব প্রজাতির বিলুপ্তিকরণ। যদিও সঠিক পর্যালোচনায় দেখা যায় ব্রিটিশরা ভারতে আগমনের পরই শিকারের মাত্রা বেড়ে যায় যথেচ্ছভাবে —

"বন্দুক থাকার কারণে তারা এই বন্যপ্রাণীদের এক বিশাল গণহত্যার প্রক্রিয়া শুরু করে, যা উত্তর আমেরিকা মহাদেশে আরও বৃহৎ এক হত্যাকাণ্ডের সমান্তরাল, যেখানে তারা চারশো কোটি প্যাসেঞ্জার পায়রা (passenger pigeon) এবং চল্লিশ লক্ষের বেশি বাইসনকে হত্যা করেছিল। অথচ স্থানীয় অধিবাসীরা খাদ্য হিসেবে কয়েক শতাব্দী ধরে শিকার করা সত্তেও এই প্রজাতি দুটি টিকে ছিল।"[৭]

এমনকি দেশীয় রাজাদের কাছে পশুশিকার করাটা গৌরব অর্জন ও বিনোদনের বড় ব্যবস্থা হিসাবে গণ্য হতো। এই ক্ষেত্রগুলিতে অপ্রয়োজনে পশু হত্যার মাত্রা ছিল অনেক বেশি।

বর্তমান পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে শিকারকে কোনোরকম সমর্থন না করেও বলা যায় যে, অরণ্যবাসীদের হাতে বন এবং বন্যপ্রাণী সঙ্কটাপন্ন নয় বরং অনেকটা সুরক্ষিত ছিল। তারা নিজেদের প্রয়োজনে প্রাকৃতিক সম্পদকে নিঃশেষ করে ব্যবহার করেনি। তাদের পরবর্তী প্রজন্মও যাতে প্রকৃতিকে আগলে রাখে তার জন্য তৈরি করেছে কঠোর অনুশাসন। তেজটার স্বামী মেঘা-ডঙ্কর থেকে মহাবিদ্যা লাভে বঞ্চিত হয় গর্ভিণী হরিণকে হত্যা করে। এটা শবরদের কাছে মহাপাপ। শবররা কোনো পশুর প্রজননকালীন ঋতুতে তাদের হত্যা করে না। এর ফলে বংশবিস্তার বাধাপ্রাপ্ত না হওয়ায় কোনো প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে যাবার আশঙ্কা তৈরি হয় না। কাল্যা তাই খুব সহজে বলতে পারে —

"হরিণ হরিণী খুঁজবে, বিয়া হবে, ছানা হবে। এখন ওদের মারলে অধর্ম হয় ঠাকুর।"[৮]

এই ধর্ম-অধর্ম বোধ আসলে প্রাচীন সমাজবন্ধনের মূল ভিত্তি।

সচেতন পরিবেশ ভাবনার আভাস পাচ্ছি আমরা বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এসে। অথচ শবর, সাঁওতাল প্রভৃতি আদিবাসী জনজাতির মধ্যে থাকা পরিবেশচেতনা বহু প্রাচীন। বলা ভালো তাদের অস্তিত্বের সঙ্গেই মিশে আছে এই চেতনা। আসলে — "ভারতবর্ষে পরিবেশ তত্ত্বাবধান কোনও বিলাসের বিষয় তো নয়ই, বরং তা মানুষ (ও জাতির) টিকে থাকার এক জরুরি ভিতও বটে।"[৯]

নগরের সীমানা বিস্তারের ফলে একদিকে শবরদের ও অন্যদিকে অরণ্যের অস্তিত্ব সংকটকে এক সুতোয় গেঁথেছেন মহাশ্বেতা দেবী তাঁর 'ব্যাধখণ্ড' উপন্যাসে। শবররা ক্রমশ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে বন অপসারণের কারণে। অরণ্যের ওপর থাবা বসাচ্ছে নগর। প্রাচীর তুলে নগরের শাসক অন্ত্যেবাসীদের বিচারণের পরিধি সংকীর্ণ করে তুলছে। ফলে শবররা পরিণত হচ্ছে পরিবেশগত উদ্বাস্তুতে। উপন্যাসটির এক জায়গায় বলা হয়েছে শবর মেয়েদের মহুয়া গাছের সঙ্গে আর শবর ছেলেদের আম গাছের সঙ্গে প্রথমে বিবাহ দেওয়া হয়। এই রীতি পালনের মধ্যে যে কামনা ধ্বনিত হয় তা হলো — "গাছের মত জীবন— আশ্রয়—অন্ন দাতা ও দাত্রী হও। গাছের মত মরণজয়ী হও। গাছ তার বীজ থেকে নতুন গাছ সির্জন করে, সে গাছের মধ্যে বেঁচে থাকে। তোমরা বেঁচে থাকবে সন্তান সন্ততির মধ্যে।"[১০]

বৃদ্ধ ডঙ্ককেও দেখা যায় দীর্ঘায়ু ও যৌবন ফিরে পাওয়ার জন্য লালায়িত হতে। তার উদ্দেশ্য কিন্তু আত্মসুখে সীমাবদ্ধ নয়, সে চায় ক্রমশ সংখ্যালঘিষ্ঠ হতে থাকা শবরদের সংখ্যাবৃদ্ধি করতে যাতে সময়ের সাথে পৃথিবী থেকে মুছে না যায় শবর সন্তানেরা। শবররা অরণ্যেই নিরাপদ। তাই বারবার বাস উঠিয়ে তারা নিবিড় শ্যামল অরণ্যে অভয়াচণ্ডীর আশ্রয়ের খোঁজে যাত্রা শুরু করে। নগর

গ্রাস করতে থাকে অরণ্যকে, নাগরিক সভ্যতা আছন্ন করে দেয় দেশের আদিম সংস্কৃতিকে। বিশ্বায়ন এবং বিশ্বায়নের ফলে উদ্ভূত পুঁজি কীভাবে সমাজ, জনজীবন ও সম্পর্কের ওপর আঘাত হানছে তারই প্রতিভূ হয়ে উঠেছে মহাশ্বেতা দেবীর 'ব্যাধখণ্ড' উপন্যাস।

তথ্যসূত্র:

১। মাধব গাডগিল, চড়াই পথের চারণিক, পৃ. ১০৩
২। মহাশ্বেতা দেবী, ব্যাধখণ্ড, পৃ. ভূমিকা অংশ
৩। ওই, পৃ. ভূমিকা অংশ
৪.। ওই, পৃ. ৪৫
৫। ওই, পৃ. ৯৬
৬। ওই, পৃ. ৪৬
৭। মাধব গাডগিল, চড়াই পথের চারণিক, পৃ. ২১৪
৮। মহাশ্বেতা দেবী, ব্যাধখণ্ড, পৃ. ৯৩
৯। রামচন্দ্র গুহ, পরিবেশবাদ, পৃ. ১৯
১০। মহাশ্বেতা দেবী, ব্যাধখণ্ড, পৃ. ১০৪

গ্রন্থপঞ্জি

আকর গ্রন্থ:

১। মহাশ্বেতা দেবী, 'ব্যাধখণ্ড', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুআরি ১৯৯৪

সহায়ক গ্রন্থ:

১। 'প্রাচীন ভারতে পরিবেশ চিন্তা', শুভেন্দু গুপ্ত, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১২
২। 'আবিশ্ব Beyond Anthropocene Capitalocene', ইমন সাঁতরা ও কৌশিক মুখার্জী সম্পাদিত, নালিকুল, হুগলী, জানুআরি ২০১৭
৩। 'বাংলা সাহিত্যে পরিবেশচেতনা রবীন্দ্রনাথ বিভূতিভূষণ জীবনানন্দ', কবিতা নন্দী চক্রবর্তী, আশাদীপ, কলকাতা, জানুআরি, ২০১৭
৪। 'মহাশ্বেতা দেবী অপরাজেয় প্রতিবাদী মুখ', নির্মল ঘোষ, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৮
৫। 'মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাসে ইতিহাস ও রাজনীতি', পম্পা মুখোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৩
৬। 'পরিবেশবাদ একটি বৈশ্বিক ইতিহাস', রামচন্দ্র গুহ (নীহাররঞ্জন বাগ অনূদিত), বুক পোস্ট পাবলিকেশন, কলকাতা, ডিসেম্বর, ২০২২
৭। 'চড়াই পথের চারণিক আমার ইকোলজি জীবন', মাধব গাডগিল (শীলাঞ্জন ভট্টাচার্য অনূদিত ও সম্পাদিত), লা স্ত্রাদা, কলকাতা, অগস্ট, ২০২৩

লেখক পরিচিতি: মৌমিতা হালদার, গবেষিকা, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ